ট্যাকিয়ন

বর্ষ ১, সংখ্যা ১

মে ২০২১

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

সম্পাদক

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ আক্তারুজ্জামান

সহসম্পাদক

শাকির আহমেদ

প্রচ্ছদ

ট্যাকিয়ন ভিজুয়্যাল আর্টস টিম

প্রকাশক

মুসতাভি আসহাব বিহন

প্রকাশনী

টেনেসাইন পাবলিকেশন

যোগাযোগ

ই-মেইল – editortachyon@gmail.com

ফেইসবুক – facebook.com/TachyonTs

টুইটার – twitter.com/TachyonTS

ইনস্টাগ্রাম –instagram.com/tachyon_bd

মূল্য - ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

করোনার সংক্রমণ আবারও বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যেও চলছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে আমরা যদি নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখি, তবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। এজন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান চর্চা করা আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। সুস্থভাবে বিজ্ঞান চর্চার জন্য তাই আমরা নিয়ে এসেছি একটি বিজ্ঞান ম্যাগাজিন। আমাদের এবারের সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন গবেষক 'খোন্দকার সিদ্দিক এ রব্বানী' স্যারের গবেষণা বিষয়ক কিছু উপদেশ। তারই সাথে গবেষণা কীভাবে শুরু করতে হবে? কেন গবেষণা করবেন এসকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামনে এ বিষয়ে আরো লেখা আসবে বলে আমরা আশাবাদী। এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুনিয়ায় চলমান সাম্প্রতিক বিষয়াবলী নিয়ে আছে কিছু লেখা। যদিও ম্যাগাজিনটিকে আমাদের সম্পূর্ণ আশানুরূপভাবে সাজাতে পারিনি, তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে সামনের সংখ্যায় সেই আশা পূর্ণ করার।

- সম্পাদক

ট্যাকিয়ন কণা কী?

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ ৪

চোর বিজ্ঞানী

নুসরাত জাহান ৭

দুই দশকের জন্য সৌরশক্তি সঞ্চয় করতে পারে এমন তরল

আবিরা আফরোজ মুনা ৯

ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে যে নয়টি বিষয় আপনি জানেন না

রিয়াদ হাসান ১১

বডি মাস ইনডেক্স

যোনাথন হাসদা ১৩

যেভাবে ট্রোজান গ্রহাণুগুলোর আবিষ্কার এবং নামকরণ করা হয়েছে

আবিরা আফরোজ মুনা ১৬

যেভাবে তুমি একজন সফল গবেষক হতে পারো

খোন্দকার সিদ্দিক এ রব্বানী ১৮

ক্ষুদে জার্নাল
টিম ট্যকিয়ন ২২

সুয়েজ খালে বাঁধ দিল কে?
কে. এম শারিয়াত উল্লাহ ২৪

পারসেভারেন্স
আবিরা আফরোজ মুনা ২৬

ল্যাবে তৈরি করা হলো কৃত্রিম ব্ল্যাকহোল
কে. এম শারিয়াত উল্লাহ ২৯

জীবাণু যুদ্ধের ইতিকথা
তনিমা ইয়াসমিন তিনা ৩১

রহস্যময়ী ডার্কম্যাটার
রাকিবুল ইসলাম ৩৪

জেনোর প্যারাডক্স
শাহরীন উৎসব ৩৭

ম্যাগাজিন পরিচিতি
টিম ট্যকিয়ন ৪১

ক্রিপ্টোগ্রাফির হাতেখড়ি পর্ব ১
নাবিদ হাসান ৪৩

ডায়ারহান্টার
মোঃ রাসেল উদ্দিন ৪৮

একটি লাঠি দিয়ে যেভাবে মাপা হলো পৃথিবীর পরিধি
সাজ্জাদুর রহমান ৫২

পৃথিবীর পতাকা
টিম ট্যকিয়ন ৫৪

রংধনুতে বেগুনি যখন লাল
মোঃ ফাহিম হাসান ইবনে হাফিজ......৫৫

(সার্নে অবস্থিত লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার। মহাবিশ্বের সূচনাকালে কণারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষের সময় কী অবস্থায় ছিল তা জানতেই এটি তৈরি করা হয়েছে। কণাকে একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে এসকল বিষয় জানা যায়। ট্যাকিয়ন কণার অস্তিত্ব যদি কখনো প্রমাণ করতে হয় তবে এ ধরণের কণা ত্বরক যন্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে। ছবি স্বত্ব - *সার্ন*)

ট্যাকিয়ন কণা কী?

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

আমাদের আশেপাশে তাকালে আমরা দেখতে পাই কতো ধরণের পদার্থ। এসকল পদার্থকে ভাঙলে আমরা দেখতে পাই আরো ছোট ছোট কণা। এদেরকে আমরা নাম দিয়েছি অণু। অণুদেরকেও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় ভাঙ্গা যায়। সেই ক্ষুদ্র কণাকে বলে পরমাণু। প্রথমে বিজ্ঞানী থমসন, তারপর রাদারফোর্ড, তারপর নিলস বোরের হাত ধরে আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি এই পরমাণুর গঠন। একটি পরমাণুতে প্রধানত তিনটি কণিকা থাকে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে নানা উপশক্তিস্তরে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন।

বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছিলেন, পরমাণুকে ভেঙ্গে যেমন এই তিনটি কণা পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এইসকল কণাদেরকেও আরো ভাঙ্গা যায় কি-না? এবং তারা এমন কণা খুঁজেও

পান। বিজ্ঞানীরা দেখান, একটি প্রোটন তিনটি কোয়ার্ক নামক কণা দ্বারা গঠিত। আবার একটি নিউট্রনও তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। এই কোয়ার্ক আবার কয়েক ধরণের হয়। কোয়ার্ক ছাড়াও আরো অনেক ধরণের কণা রয়েছে যেমন- লেপটন, মিউয়ন, পাইয়ন, কেয়ন। এদেরকে বলে প্রাথমিক কণা (Elementary Particle)।

যে কোনো কণাকে তাদের গতির ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ব্র্যাডিয়ন – যেসকল কণার গতি আলোর গতি থেকে কম। যেমন, ইলেকট্রন। **(খ) লাক্সন** - যেসকল কণার গতি আলোর গতির সমান। যেমন, ফোটন। **(গ) ট্যকিয়ন** – যেসকল কণার গতি আলোর গতির থেকে বেশি।

প্রথম দুই ধরণের কণাকে আমাদের আশেপাশের জগতে নিয়মিত পাওয়া গেলেও তৃতীয় প্রকার কণাদেরকে আমাদের আশেপাশে পাওয়া যায় না। তাই এটি এখনো একটি তাত্ত্বিক কণা হিসেবেই বিবেচিত হয়। একে পরীক্ষাগারে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

১৯০৪ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সমারফিল্ড একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে তিনি দেখান আলোর গতির অধিক গতিবিশিষ্ট কোনো কণা থাকলে তাদের গতি প্রকৃতি কেমন হবে। ১৯৬৭ সালে এ নিয়ে বিষদ আলোচনা করেন বিজ্ঞানী জেরাল্ড ফাইনবার্গ। এখন পর্যন্ত এর পরিক্ষামূলক অস্তিত্ব প্রমাণ করা না গেলেও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না কোনোভাবেই।

ট্যকিয়ন কি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ভঙ্গ করে?

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের দুইটি স্বীকার্যের মধ্যে একটি স্বীকার্য হলো, কোনো কিছুই আলোর গতি থেকে বেশি গতিতে চলতে পারে না (Nothing can travel faster than the speed of light)। তাহলে কি ট্যকিয়ন কণা আইন্সটানের আপেক্ষিক তত্ত্ব ভঙ্গ করে? উত্তর হচ্ছে, না। এখানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব লঙ্ঘন হয় না। আসলে আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্যটি আমরা একটু ভুলভাবে বলি। সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদেরকে বলতে হবে, কোনো ধনাত্মক বাস্তব ভরবিশিষ্ট বস্তু আলোর গতি থেকে বেশি গতিতে চলতে পারে না (No thing can travel faster than the speed of light) কিন্তু ধারণা অনুযায়ী ট্যকিয়নের ভর আমাদের আশেপাশে দেখা ভরের মতো নয়। বরং এর ভর একটি কাল্পনিক সংখ্যা। তাই এর ভরকে বর্গ করলে ঋনাত্মক মান পাওয়া যায়, যা স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা। তাই এখানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য ভঙ্গ হয় না।

এবার ট্যকিয়নের কিছু উদ্ভট বৈশিষ্ট্যের কথা বলি।

ধর, একজন লোক একটি বন্দুক নিয়ে আরেকজন লোকের দিকে বন্দুকের নল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকে ভিতর যেই বুলেট তা ট্যকিয়ন কণা দ্বারা তৈরি করা। যেহেতু ট্যকিয়ন কণার গতি আলোর গতির থেকেও বেশি, তাই বন্দুকের ট্রিগার চাপার আগেই বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে অপর লোকটিকে আঘাত করবে। আজব না? এটি একটি প্যারাডক্সের জন্ম দেয় যাকে ক্যাজুয়ালিটি প্যারাডক্স বলে।

ট্যকিয়ন কণার ভর যেহেতু কাল্পনিক তাই এরা সময়ের সাথে সামনে যায় না, বরং সময়ের সাথে পিছনে যায়। অর্থাৎ, এরা অতীতে যায় (টাইম ট্রাভেল?)।

আমরা সাধারণত দেখি, কোনো বস্তুর গতি বৃদ্ধি পেলে এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ট্যকিয়নের জন্য শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গতি হ্রাস পায়। আবার শক্তি হ্রাস পেলে গতি বৃদ্ধি পায়। ট্যকিয়ন কণার সর্বনিম্ন বেগ হচ্ছে শুন্য মাধ্যমে আলোর বেগের সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 299792458 মিটার।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, কোয়ান্টাম টানেলিং ঘটার সময় ফোটন কণা নিজেই শুন্য মাধ্যমে আলোর গতি থেকে বেশি গতিতে চলে।

ট্যকিয়ন আসলেই আছে না-কি নেই তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে এখনো সন্দেহ থাকলেও এই নামে একটি ম্যাগাজিন তো বাংলা ভাষায় থাকতেই পারে তাই না? আমরাও চাই ট্যকিয়নের মতো দূর্দান্ত গতিতে বিশ্বকে জয় করতে এবং সবার মাঝে বিজ্ঞানের জ্ঞান পৌছে দিতে।

পৃথিবী ঘুরলেও আমরা ছিটকে পড়ি না কেন?

পৃথিবী প্রতি ঘন্টায় প্রায় ১০০০ মাইল বেগে নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে। প্রশ্ন হতে পারে, পৃথিবী যেহেতু এত বেগে ঘুরছে, তাহলে আমরা ছিটকে পড়ে যাচ্ছি না কেন? এর উত্তর হচ্ছে জড়তা। তুমি যখন বাসে থাকো, তখন বাস যদি ১০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে বেগে চলে, তবে তোমার বেগও কিন্তু ১০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডই হবে। অর্থাৎ, তোমার ও পৃথিবীর মাঝে কোনো আপেক্ষিক বেগ নেই। তেমনি তুমি যখন পৃথিবীতে আছ, তখন তোমার বেগ পৃথিবীর বেগের সমান। তোমাদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ নেই। ফলে তোমার কাছে পৃথিবী স্থির মনে হয়। তাই ছিটকে যাওয়ার কথাও আসে না।

চোর বিজ্ঞানী

নুসরাত জাহান, শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি, কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল

লেজার লাইট আর গ্যাজেটটা ব্রিফকেসে ভরে ল্যাবের পথে রওনা হলেন ড. হ্যালেন। হঠাৎ চোখে অন্ধকার। নাকের উপর কিছু একটা চেপে ধরে আছে কেউ। ৭ ফুট লম্বা প্রায় ভয়ঙ্কর শক্তিশালী তিনজন মানুষ তাকে তুলে নিলো একটি কালো মাইক্রোবাসে।

দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে মুখের হাসিটা আরো প্রশস্ত হলো ড. জেমি ব্লাকহোয়েলের। পশুর মতো দেখতে একজন এগিয়ে এসে তার হাতে তুলে দিলো কালো ব্রিফকেসটা।

জেমির মুখ হাসি হাসি। পছন্দের কালো মারসেডিজের ড্রাইভিং সিটে বসলো জেমি। দ্রুতই তার স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে। রাতারাতি দুনিয়ার সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীর খেতাব পেতে চলেছে সে। তারপর? তারপর কী হবে? তার অতিত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব বদলে যাবে! সে কি অমর হবে? দুনিয়াবাসি কি তার কথায় উঠবে বসবে? ভাবতে ভাবতেই চলে এলো তার গুপ্ত আস্তানার কাছে। গাড়ি থেকে নেমে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে পাঁচ মিনিট দ্রুত পায়ে হেটে চলে এলো তার গুপ্ত কুঠুরির সামনে।

এ জায়গাটি তার একান্তই ব্যাক্তিগত। কাউকেই এখানে আসতে দেয়া হয় না। শহরের শেষ প্রান্তে জঙ্গলা রাস্তা ধরে ভিতরে এগিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হয়। তারপর মিনিট দশেক হাটার পরেই সেই গুপ্ত কুঠুরি। রিমোটের সবুজ বোতামে চাপ দিলেন ড. জেমি। আন্ডারগ্রাউন্ডের দরজা খুলে গেলো। অ্যাস্কালেটরে পা দিয়ে লাল বোতাম চাপলেন জেমি। তড়তড় করে নিচে নেমে এলো অ্যাস্কালেটর। আবার সবুজ বোতামে চাপ দিয়ে এগিয়ে গেলেন স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি মজবুত সুবিশাল এক দরজার সামনে। এ যেন ভবিষ্যতে যাওয়ার কোনো গুপ্ত রাস্তা। দরজার এক কোণে ছোট একটা স্ক্রিনে পরিচিত দশটি ল্যাটিন নাম্বার। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কয়েকটি নাম্বার চাপলেন জেমি। ১ সেকেন্ডের মধ্যেই প্রকাণ্ড দরজাটি খুলে গেলো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ভেতরে

ঢুকেই পাশের দেয়ালে থাকা সুইচে ট্যাপ করলেন জেমি।

ধবধবে সাদা ঘরটির একপাশে সুবিশাল আয়না। অন্যপাশে সাজানো রয়েছে নানারকম আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর দেয়াল ঘেষা শেল্ফে নানান কেমিক্যাল। এসবের কিছুই যে খুব একটা ব্যবহৃত হয় না তা বোঝা যাচ্ছে এদের অবস্থা দেখে।

আর দেরি করা ঠিক হবে না, বলতে বলতেই বাম হাতের ব্রিফকেসটা মাঝের বড় সাদা টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখলেন জেমি। ব্রিফকেস থেকে বের করলেন ভারি গোলাকৃতির ৬০ সেন্টিমিটার পরিধি বিশিষ্ট মসৃণ একটি বস্তু। পাশেই রাখা আছে দশ সেন্টিমিটার লম্বা একটি লেজার লাইট। জেমির চোখ চকচক করছে। দেরি করা যাবে না, এখনি ফার্স্ট এন্ড ফাইনাল টেস্ট সেরে ফেলতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। লেজার লাইটটা নিয়ে বিশাল চকচকে আয়নার সামনে দাঁড়ায় জেমি। গ্যাজেটের উপরে থাকা মসৃণ কালো বোতামটি চাপলেন জেমি। সঙ্গে সঙ্গে মাঝখান থেকে দুপাশে সরে গেলো দুটি পাত। ছোট একটা সিঁড়ি মাঝখান থেকে নেমে এলো। যেন বাচ্চাদের খেলনা। দ্রুতই গ্যাজেটটি সেটআপ করে পায়ের কাছাকাছি রাখলেন জেমি। মসৃণ ভারি লেজার লাইটটার দিকে দুপলক তাকিয়ে থেকে কালো বোতামে চাপ দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরেন। দুসেকেন্ড পর আয়নার দিকে তাকিয়ে সশব্দে চিৎকার করে উঠেন জেমি। "আমি!... আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি! আমি ভবিষ্যতে পারি দেবো! আই ক্যান্ট বিলিভ মাই আইস! আই ক্যান্ট বিলিভ মাইসেল্ফ!"

মসৃণ ভারি লেজার লাইটটার দিকে দুপলক তাকিয়ে থেকে কালো বোতামে চাপ দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরেন। দুসেকেন্ড পর আয়নার দিকে তাকিয়ে সশব্দে চিৎকার করে উঠেন জেমি।

জেমির উচ্চতা দুই ফুটে নেমে এসেছে। এবার হাতের ভারি লেজার লাইটটাকে পায়ের কাছে রাখলেন জেমি। পাচঁ সেকেন্ডের টাইমার সেট করে দিলেন। তিনি কোয়ার্ক এর সমান হতে রাজি নয়। পাঁচ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রাখলেন জেমি। চোখ খুলতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। মাথার উপর প্রায় তার সমান একটি আটপেয়ে একশ চোখা প্রাণী উড়ে বেড়াচ্ছে। এটি একটি মশা! ভেবেই হাসি পেয়ে গেলো জেমির। তার হাসি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পাশে ফিরেই দেখলেন ড্রাগনের মতো দেখতে বিশাল বড়ো লেজের একটি চার পেয়ে প্রাণী তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পেছন ফিরে দৌড় দিতে যাবেন, পরক্ষণেই প্রাণীটির আঠালো জিভ তাকে টেনে নিয়ে গেল গভীর অতলে।

চোখ খুলে আচমকা উঠে বসলেন ড. হ্যালেন। এমন দুঃস্বপ্ন তিনি আগে কখনো দেখেন নি। বিড়বিড় করে বললেন, "আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু জেমি কখনো এটা করবে না।" বলতে বলতেই ল্যাবের দিকে দৌড়ালেন হ্যালেন।

- একি জেমি! তুমি এখানে কী করছ?

দুই দশকের জন্য সৌরশক্তি সঞ্চয় করতে পারে এমন তরল

আবিরা আফরোজ মুনা

সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সৌরশক্তি। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তা সূর্য কিরণ ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল ইত্যাদি আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি। তবে যে হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে এতে একসময় এর সংকট দেখা দিবে। এছাড়াও আমাদের উন্নয়ণ অনেকাংশে নির্ভর করছে শক্তির উপর। তাইতো বিজ্ঞানীরা সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করার উপায় খুঁজে বের করতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছেন একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা সৌরবিদ্যুতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী শক্তি সঞ্চয় করার দিকে আরও একটি অভিনব পদক্ষেপ বের করতে সমর্থ হয়েছেন। 2018 সালে, সুইডেনের বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিশেষায়িত তরল তৈরি করেছেন যা 18 বছর অবধি সূর্য থেকে নেওয়া শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারবে! এই তরলটি রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো। তবে বিদ্যুতের পরিবর্তে এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে সূর্যের আলো। সুইডেনের চালমারস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই তরলটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। MOST (Molecular Solar Thermal Energy Storage System) নামে সৌরতাপ সংগ্রহকারী একটি পদ্ধতিতে এটি কাজ করে। একটি চক্রের মাধ্যমে স্বচ্ছ টিউবের মধ্য দিয়ে একটি পাম্প তরলটিকে আবদ্ধ করে রাখে।

যখন সূর্যের আলো তরলটির সংস্পর্শে আসে, তখন এর পরমাণুর মধ্যে বন্ধনগুলি পুনরায় সেজে উঠে শক্তি সমৃদ্ধ আইসোমারে রূপান্তরিত হয়। এতে করে সূর্যের শক্তি আইসোমারের শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধনের মধ্যে ধরা পড়ে যায়। ঘরের তাপমাত্রায় তরলটির অণুগুলো শীতল হয়ে গেলেও শক্তি সেখানে আটকা পড়তে পারবে। এমন ব্যবস্থাটি অবশ্য গবেষকদের দ্বারাই বিকাশিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে তরলটি একটি অনুঘটক দ্বারা প্রবাহিত হয়।

চিত্র: ২০১৮ সালে, সুইডেনের বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিশেষায়িত তরল তৈরি করেছেন যা ১৮ বছর অবধি সূর্য থেকে নেওয়া শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে! এই তরলটি রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো। তবে বিদ্যুতের পরিবর্তে এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে সূর্যের আলো।

অনুঘটক কী? যেসব পদার্থের উপস্থিতিতে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় কিন্তু বিক্রিয়া শেষে উক্ত পদার্থের ভর ও রাসায়নিক সংযুতি অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে প্রভাবক বা অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট বলে। 1836 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস লক্ষ্য করেন যে, এমন কিছু বস্তু আছে যেগুলোর উপস্থিতিতে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় কিন্তু বিক্রিয়ার পর ঐ সকল বস্তু ভর ও ধর্মে অপরিবর্তিত থাকে। তিনি বস্তুগুলির নাম দেন প্রভাবক বা অনুঘটক (Catalyst)। যখন কক্ষের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় তখন তরলটির অণুগুলো শীতল হয়ে গেলে প্রক্রিয়াটি অনুঘটক দ্বারা প্রবাহিত হয়ে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যা তরলটিকে 113° F (63° C) তাপী করে তোলে। এর ফলে অণুগুলো তার মূল আকার ফিরে পায়। তাই তরলটি তার কাজ অর্থাৎ সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে যেতে পারে। শক্তির চাহিদা মেটাতে শক্তি-সমৃদ্ধ এই তরলটি ঘরের ওয়াটার হিটার, ডিশ ওয়াশার, কাপড়ের ড্রায়ার এবং আরও অনেক কিছুতে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। শিল্প কারখানায় রান্না, জীবাণুমুক্তকরণ, ব্লিচিং এবং পাতন রোধে ব্যবহৃত স্বল্প-তাপমাত্রার উত্তাপ দেওয়া সহ নানা কাজে এই তরলটিকে ব্যবহার করা যাবে। তরলটির শক্তি একবার শেষ হয়ে গেলে, সৌর আলো দিয়ে এটিকে আবারও রিচার্জ করে ব্যবহার করা যাবে। তরলটি প্রতি কেজিতে (2.2 পাউন্ড) 250 ওয়াট প্রতি ঘন্টা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, যা কিনা টেসলা পাওয়ারওয়াল ব্যাটারিগুলির শক্তির প্রায় দ্বিগুণ! 2020 সালের শেষের দিকে, একটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রকল্প বড় আকারের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নতুন এই প্রযুক্তিটির প্রোটোটাইপগুলো বিকাশ করতে 4.3 মিলিয়ন ইউরো মঞ্জুর করেছে। এটি সাড়ে তিন বছর অবধি চলবে। আগামী 10 বছরের মধ্যেই এই প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিক ব্যবহারে চলে আসবে বলে গবেষকরা বিশ্বাস করেন!

ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে যে নয়টি বিষয় আপনি জানেন না

রিয়াদ হাসান, শিক্ষার্থী, নবীনগর পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

১

ব্ল্যাকহোল আসলে নক্ষত্র থেকে জন্ম নেয়। একটি নক্ষত্রের ভর যদি খুব বেশি হয়, তবে তা তার জ্বালানি শেষে নিজ আকর্ষণ বলের কারণে সংকুচিত হতে থাকে। ফলে এর মুক্তিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন একসময় আসে যখন এর মুক্তিবেগ আলোর বেগের সমান হয়ে যায়। ফলে আলোও এর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায় না। ফলে একে কালো দেখায়।

২

ব্ল্যাকহোল আসলে কোনো ছিদ্র বা হোল নয়। ছিদ্র একটি দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসলে একে যদি আমরা ত্রিমাত্রিক ভাবে চিন্তা করি তবে এটি একটি গোলক। যদি আরো শুদ্ধভাবে বলি তবে বলতে হবে উপগোলক (Spheroid)।

৩

ব্ল্যাকহোলের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে যার ভিতর প্রবেশ করলে আলোর কণাও আর বের হতে পারে না। এই অঞ্চলের যে ব্যাসার্ধ রয়েছে তাকে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ বলে।

৪

ব্ল্যাকহোল আসলে আকারে বড় হলে হয় না। বরং আকারে ছোট হলে হয়। অবাক হলেন? একটি নক্ষত্রের ভর যদি ৩ থেকে ১০ সৌরভরের মধ্যে হয় তবে তাকে একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত করলে তার আয়তন পূর্বের তুলনায় প্রচুর সংকুচিত করতে হয়। ফলে নক্ষত্র থাকা অবস্থায় এর যে আয়তন ছিল, ব্ল্যাকহোল হলে এর আয়তন তার থেকে কমে যায়।

৫

একটি ব্ল্যাকহোল চিরস্থায়ী হয় না। হকিং বিকিরণের মাধ্যমে একটি ব্ল্যাকহোল থেকে ভার্চুয়াল কণা বেরিয়ে যায়। ফলে একসময় ব্ল্যাকহোল সংকুচিত হতে থাকবে এবং একসময় উবে যাবে।

ব্ল্যাকহোল আবর্তন করে। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু মহাকর্ষ বলের কারণে একটি অক্ষ বা বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে। ব্ল্যাকহোলও এর বিপরীতে যায় বা। এদের মধ্যে যেগুলো ছোট ব্ল্যাকহোল সেগুলো বেশি জোরে ঘুরে ও যেগুলো বড় ব্ল্যাকহোল সেগুলো ধীরে ঘুরে।

৬

৭

ব্ল্যাকহোল পুরোপুরি কালো নয়। ব্ল্যাকহোলের ভিতর কোনো বস্তু আকর্ষিত হয়ে পতিত হওয়ার কালে আলোক কণা তার উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ফলে ঘটনা দিগন্তের কাছাকাছি বাইরের দিকের অঞ্চলটি পুরোপুরি কালো হয় না।

ব্ল্যাকহোল বড়ো হয়। ব্ল্যাকহোল তার আশেপাশে থাকা বস্তু ও পাশ দিয়ে যাওয়া বস্তুকে আকর্ষণ করে নিজের ভিতরে নিয়ে নেয়। ফলে তা বড় হয়। দুটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ ঘটলেও তারা একটি বিশাল ব্ল্যাকহোলের জন্ম দেয়।

৮

৯

সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব প্রায় বাতাসের ঘনত্বের সমান। বিশ্বাস হচ্ছে না? আসলে ছোট ব্ল্যাকহোলগুলোর ভরের তুলনায় আয়তন কম হওয়ায় ঘনত্ব বেশি হয়। কিন্তু সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ভরের তুলনায় আয়তন হয় বেশি। ফলে ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব কমে যায়। সাধারণত সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব ১০০ কেজি/ঘনমিটার হয় যা পানির ঘনত্বের তুলনায় ১০ গুন কম। তবে এর ঘনত্ব বায়াসে ঘনত্বের সমানও হতে পারে।

(বৈষ্ণব রানের লেখা *'ব্ল্যাকহোল', ফোর্বসও সায়েন্টিফিক আমেরিকানের*কিছু আর্টিকেল থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাজানো)

বডি মাস ইনডেক্স

যোনাথন হাসদা,

শিক্ষার্থী,

রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স কী?

স্বাস্থ্যকে আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা উপহার হিসেবে গণ্য করতে পারি। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এটা এখন আমরা যথেষ্ট ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। কারণ সুস্বাস্থ্যই একটি আদর্শ দেহ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আর আমরা আগে থেকেই জানি যে সুস্থ দেহেই একটা সুস্থ মন বিরাজ করে।

অনেক আগে সাধারণ মানুষ ভাবতো, স্বাস্থ্যবান মানুষ তারাই যারা দীর্ঘকায় ও মোটাসোটা। কিন্তু বিজ্ঞান বলে দীর্ঘকায় ও মোটাসোটা মানেই স্বাস্থ্যবান নয়। তাই এখন পূর্বোক্ত ধারণাটি আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009 অনুসারে স্বাস্থ্য হচ্ছে: রোগ - ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থা। তাই যারা বেশি মোটা তারা কিন্তু সকলেই স্বাস্থ্যবান মানুষ হতে পারে না। বরং যারা বেশি মোটা তারাই নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। এ ধরণের অত্যাধিক মোটা হওয়ার প্রবণতাই হলো **স্থূলতা**। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক নতুন শাখা সৃষ্টি হয়েছে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যেতে থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের

জন্য উচ্চতা ও দেহের ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকেই **বডি মাস ইনডেক্স বা দেহের ওজন সূচক** বলা হয়। সংক্ষেপে একে BMI নামে ডাকা হয়।

বডি মাস ইনডেক্স জানার সময় আমরা একটি শব্দ 'স্থূলতার' সাথে পরিচিত হয়েছি। এখন একটু সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করি।

স্থূলতা কাকে বলে?

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে আদর্শ দৈহিক ওজনের 20% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলা হয়। স্থূলতা দেহের এমন একটা অবস্থা যখন কোনো মানুষ শারীরিকভাবে মোটা হতে থাকে।

কীভাবে বুঝবো যে আমি স্থূলতার দশায় অবস্থান করছি কিনা?

স্থূলতার দশা নির্ণয় করার জন্যই BMI বা Body Mass Index এর ধারণা অবতরণ করা হয়েছিলো। বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী এডলফ কোয়েটিলেট সর্বপ্রথম দেহের এই সূচকটির ভিত্তি উপস্থাপন করেন। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী 1830-1850 সালের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

BMI বা দেহের ওজন সূচক কীভাবে নির্ণয় করব?

বডি মাস ইনডেক্স বা দেহের ওজন সূচকের সংজ্ঞা থেকে আমরা জেনেছি যে একজন মানুষের দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকেই দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স বলা হয়।

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে,

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন}\,(kg)}{\text{উচ্চতা}\,(m^2)}$$

মনে করুন, আপনার দেহের ওজন 60 কেজি এবং আপনি 5ফুট 6ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি। এক্ষেত্রে আপনার BMI এর মান কত? বা আপনি স্থূলতার কোন পর্যায়ে অবস্থান করছেন। চলুন প্রথমে BMI এর মান করি!

এখানে আপনার দেহের ওজন = 60 কেজি এবং দেহের উচ্চতা = 5 ফুট 6ইঞ্চি

আমরা জানি, 1 ইঞ্চি = 0.0833 ফুট
অতএব, 6 ইঞ্চি = $(0.0833 \times 6) = 0.4998$ ফুট

তাহলে আপনার উচ্চতা দাঁড়ালো = $(5 + 0.4998)$ ফুট = 5.4998 ফুট

আমরা জানি 1ফুট = 0.305মিটার

অতএব, 5.4998ফুট = 0.305 × 5.4998
= 1.677439 মিটার।

উপরোক্ত সমীকরণে উপযুক্ত মান বসিয়ে পাই

$$BMI = \frac{60}{(1.677439)^2} = 21.32$$

অতএব আপনার দেহের ওজন সূচক হলো
21.32

এখন নিচের ছক লক্ষ্য করি। এখানে BMI এর মানের শ্রেনীর বিভাগ করানো হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে আপনার BMI এর মান যদি 18এর নিচে থাকে তখন বুঝতে হবে যে আপনি রোগা শরীর নিয়ে বসবাস করছেন।

BODY MASS INDEX (BMI)	
CLASSIFICATION	BMI SCORE (kg/m2)
Underweight	< 18.5
Normal	18.5 - 24.9
Overweight	25.0 - 29.0
Obese	30.0 - 40.0
Extreme Obese	> 40.0

আপনার মান যদি 18.5 – 24.9 হয় তাহলে আপনি স্বাভাবিক এবং সুস্থ দেহে বিরাজমান। অতিরিক্ত ওজনের ক্ষেত্রে এর মান সাধারণত 25.0 – 29.0 হয়ে থাকে।

আর স্থূলতার প্রথম স্তর ক্ষেত্রে 30 – 34.9হয়ে থাকে। আপনার মান যদি 35 – 40হয় তাহলে আপনি স্থূলতার ২য় পর্যায়ে আছেন। আপনি যদি দেহের ওজন সূচকে 40এর বেশি মান দেখিয়ে থাকেন তাহলে আপনি স্থূলতার ৩য় পর্যায়ে আছেন। যার ফলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার শারীরিক অবস্থা অনেকটা অবনতির দিকে। যেকোনো সময় সমস্যা আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে।

কারন স্থূলতার কারনে করোনারি হৃদরোগ, টাইপ -২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, আরও অনেক অনেক ভয়াবহ রোগ হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

স্থূলতার কী কারণে হয়?

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া নিদ্রাহীনতা, উপযুক্ত বিশ্রাম, জিনগত, পারিবারিক জীবনযাত্রা, মানসিক আঘাত ইত্যাদিও স্থূলতার কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

কীভাবে স্থূলতা প্রতিরোধ করবো?

এক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিদিন সকালে হাঁটা, সাঁতার কাটা ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেকাংশে স্থূলতাকে পরিহার করা হয়। তারপর স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, লোভনীয় খাবার পরিহার করা, সম্ভব হলে দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।